আগস্ট, ২০১৭

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

● এই সংখ্যায় ৩

● এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

● ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর : এক দৃষ্টান্ত — অরুণ গোয়েল ৫

● জি এস টি : ভারতের ইতিহাসে এক মাইলফলক — টি. এন. অশোক ৮

● জি এস টি রূপায়ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ — গিরীশচন্দ্র প্রসাদ ১১

● জি এস টি : নতুন যুগের ভোর — উপেন্দর গুপ্তা ১৩

● এক 'এক দেশ-এক কর'-এর দেশে — অনিন্দ্য ভুক্ত ১৬

● পণ্য ও পরিষেবা কর : উপভোক্তাদের দৃষ্টিতে — সুরজ জয়সওয়াল ২৩

● পণ্য পরিষেবা কর : সহজ হবে ব্যবসাবাণিজ্য — দানিশ এ. হাশিম, বর্ষা কুমারী ২৬

● পণ্য ও পরিষেবা কর : পট পরিবর্তনের চাবিকাঠি — দেবরাজা রেড্ডি ৩০

বিশেষ নিবন্ধ

● জি এস টি নেটওয়ার্ক — প্রকাশ কুমার ৩৩

ফোকাস

● জি এস টি : কেন্দ্র রাজ্যের সংঘাত কি বাড়াবে? — জয়ন্ত রায়চৌধুরী ৩৬

অন্যান্য নিবন্ধ

● বিয়াল্লিশের কথকতা — ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮

● আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সিসল চাষ — ড. সিতাংশু সরকার ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

● জানেন কি? — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ৪৮

● যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৯

● যোজনা নোটবুক — —ওই— ৫০

● যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৫১

● উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সিসল চাষ

ড. সিতাংশু সরকার

মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। উপরন্তু জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের ফলে প্রথাগত কৃষিতে উৎপাদন ও মুনাফা দুই-ই নিম্নমুখী। এই অবস্থায় আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে নতুন পন্থা পদ্ধতিকে হাতিয়ার করতে হবে। যেহেতু তারা এখনও জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষের উপরই বেশি নির্ভরশীল, তাই বিশেষ জোর দিতে হবে শস্যের ফলন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও অপ্রথাগত থেকে নতুন শস্যের চাষে। যার সার্থক উদাহরণ 'সিসল'।

ভারতের আদিবাসী (তপশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত জন-সমাজ) সম্প্রদায়ের মানুষের বেশির ভাগের বাস সাধারণত দু'টি অঞ্চলে। প্রথমত, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে এবং দ্বিতীয়ত, মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলে। মধ্য ভারতের এই রাজ্যগুলি হল—ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা (পশ্চিমাঞ্চল) এবং পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিমাঞ্চল)। একথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশার গ্রামীণ জনসংখ্যার বড়ো অংশ (২৫.৭ থেকে ৩৬.৯ শতাংশ) আদিবাসী (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশে ১৯-টি, ওড়িশায় ১৪-টি এবং ঝাড়খণ্ড ও ছত্রিশগড়ের ১৩-টি করে জেলায় আদিবাসীদের জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগের বেশি।

এই রাজ্যগুলির আদিবাসীদের গড় শিক্ষার হার এখনও সর্বসাধারণের তুলনায় অনেকটাই কম। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, আদিবাসীদের সিংহভাগ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা আদিবাসীদের শতকরা অংশভাক ওড়িশায় সব থেকে বেশি ৭৫.৬ শতাংশ; তারপরে মধ্যপ্রদেশে ৫৮.৬ শতাংশ; ছত্রিশগড়ে ৫৪.৭ শতাংশ; ঝাড়খণ্ডে ৫৪.২ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪২.৪ শতাংশ—যা কিনা পিছিয়ে পড়া অবস্থাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। জোতের মাপ অনুযায়ী এই মালভূমি অঞ্চলের গ্রামীণ আদিবাসী কৃষকদের বেশিরভাগই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষি (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। এই আদিবাসীরা, যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই প্রকৃত কৃষক। বাকি বেশিরভাগই কৃষি-শ্রমিক হিসাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ অঞ্চলে মোট কর্মসংস্থানের সিংহভাগই কৃষি-শ্রম থেকে আসে। এই কৃষি-শ্রমের দ্বারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছত্তিশগড়ে ৭৩.৪ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ৬৮.৭ ভাগ, ওড়িশায় ৬৪.৯ ভাগ, ঝাড়খণ্ডে ৬১.১ ভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে ৫৮.৮ ভাগ।

আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন না হওয়ার পিছনে অন্যান্য কারণের সঙ্গে কৃষিতে নিম্ন উৎপাদনশীলতা বিশেষভাবে দায়ি। এই অঞ্চলে সেচ-সেবিত জমির পরিমাণ কম এবং বৃষ্টি-নির্ভর খরিফ চাষ প্রচলিত এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ধান বা ওই জাতীয় তণ্ডুল শস্যের চাষ করার ফলে ফলন অনেকটাই কম। তাছাড়া জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তন, অন্যান্য অঞ্চলের মতোই (বা কিছু ক্ষেত্রে বেশি প্রকট) এই অঞ্চলকেও বেশি বেশি উষ্ণ করে তুলেছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাতও ক্রমশ অনিয়মিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই লক্ষ্য করা গেছে, টানা বেশ কিছুদিন বৃষ্টিহীন চলার পরে, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। এই অঞ্চলের

[লেখক ব্যারাকপুরে অবস্থিত ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী (শস্য বিজ্ঞান) এবং প্রধান, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ। ই-মেল : sitangshu.sarkar@icar.gov.in]

সারণি-১
আদিবাসী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান : শতকরা ভাগ, শিক্ষিতের হার ও অর্থনৈতিক অবস্থা

রাজ্য	মোট গ্রামীণ জনসংখ্যায় আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা ভাগ	শতকরা ২৫ ভাগের বেশি আদিবাসী জনসংখ্যা বিশিষ্ট জেলার সংখ্যা	শিক্ষিতের হার		দারিদ্র্যসীমার নিচে গ্রামীণ জনসংখ্যা	
			সাধারণ	আদিবাসী	আদিবাসী	অন্যান্য
ওড়িশা	২৫.৭	১৪	৭২.৯	৫২.২	৭৫.৬	২৩.৪
ঝাড়খণ্ড	৩১.৪	১৩	৬৬.৪	৫৭.১	৫৪.২	৩৭.১
ছত্রিশগড়	৩৬.৯	১৩	৭০.৩	৫৯.১	৫৪.৭	২৯.২
মধ্যপ্রদেশ	২৭.২	১৯	৬৯.৩	৫০.৬	৫৮.৬	১৩.৪
পশ্চিমবঙ্গ	৭.৮	০	৭৬.৩	৫৭.৯	৪২.৪	২৭.৫
ভারত	—	—	৭৩.০	৫৯.০	৪৭.৩	১৬.১

সূত্র : স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোফাইল অব সিডিউল্ড ট্রাইব্স ইন ইন্ডিয়া, ভারত সরকার, ২০১৩

মাটি এবং আঞ্চলিক ঢাল অল্প সময়ের মধ্যে হওয়া বৃষ্টির জলকে মাটির গভীরে প্রবেশ করানোর উপযুক্ত নয়। ফলে সেই বৃষ্টিপাতের বেশির ভাগটাই ভূগর্ভস্থ জলস্তরে পৌঁছতে পারে না বা সহজে বলা যায় কোনও কাজে লাগে না, বরং মাটি ক্ষয়ের বা ভূমি ধসের কারণ হয়। বিজ্ঞানীরা জলবায়ুর দীর্ঘ দিনের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন যে ভারতে তাপমাত্রার গড় বৃদ্ধি ২০২০ সালে ১.৮১ ডিগ্রি, ২০৫০ সালে ২.৮৭ ডিগ্রি এবং ২০৮০ সালে ৫.৫৫ ডিগ্রি বা তারও বেশি হবে। তাপমাত্রার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রভাব সারা দেশের সঙ্গে এই মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলে আরও বেশি করে প্রকট হবে এবং এর কুপ্রভাবে কৃষির ফলন কমবে ও চাষ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীরা ইতোমধ্যেই আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে; তাছাড়া পরিবর্তিত জলবায়ুতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরও অবনতি হবার আশঙ্কা থাকছে। গ্রামীণ আদিবাসীদের প্রচলিত কৃষিতে সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং তার সঙ্গে অপ্রচলিত ফসলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে, যা কিনা পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাইয়ে যথেষ্ট উৎপাদন দেবে এবং চাষিদের মুনাফা বাড়াবে। এই ধরনের নতুন পদ্ধতির এবং নতুন ফসলের চাষ ভিন্ন গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি রোধ করা যাবে না। ফলস্বরূপ আদিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে ক্রম অবনতির দিকে এগিয়ে যাবে, অর্থনৈতিক অসাম্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে। এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি থেকে মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের বাঁচাতে-পরিবর্তিত জলবায়ুতে এই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সিসল চাষ এবং সিসল তন্তু উৎপাদনের কথা ভাবা যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে সিসল, এই অঞ্চলের জন্য নতুন কোনও উদ্ভিদ নয়। এই অঞ্চলে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে সিসল প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে আছে এবং এখানকার চাষিরা এর চাষও করেন। তবে এই ফসলের চাষ পুরোপুরিভাবে অযত্ন ও অবহেলায় করা হয়।

এখানে সিসলের পরিচয় সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা দরকার। সিসল, এসপ্যারাগাছি উদ্ভিদ পরিবারভুক্ত, বহু বর্ষজীবী মরু উদ্ভিদ, যার তলোয়ারের মতো শক্ত লম্বা পাতা থেকে তন্তু নিষ্কাশন করা হয়। ভারতে বিভিন্ন ধরনের সিসল পাওয়া যায়, তবে এ্যাগেভ সিসলানা, এ্যাগেভ ক্যান্টালা ইত্যাদিই প্রধান। স্থানীয় ভাষায় সিসলের বিভিন্ন নাম চালু আছে। ওড়িয়া ভাষায় সিসলকে 'মোরবা' বা 'মোরাব্বা' বা 'হাতিবেড়া'; দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় 'কাট্টালাই' বা 'কাখাড়া'; উত্তর ভারতে 'রামবাঁশ' ইত্যাদি নাম প্রচলিত আছে। পরিবর্তিত ও উষ্ণ জলবায়ুতে সিসল সহজেই চাষ করা যায় এবং উচ্চ উৎপাদনশীলতা বজায় থাকে। সিসল যথেষ্ট গরম আবহাওয়া সহ্য করতে পারে, চাষ করতে কোনও জলসেচের প্রয়োজন হয় না (বৃষ্টি নির্ভর চাষ)। এই চাষে পুরো জমিতে লাঙ্গল দিয়ে মাটি আলগা করতে হয় না (ছোটো ছোটো গর্ত করে চারা লাগানো হয়) ফলে মাটি ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই, বরং লাইন করে সিসল লাগালো তা জমিতে বৃষ্টির জলের স্রোতের দ্বারা সৃষ্ট মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং বৃষ্টির জল মাটির গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। সিসল চাষের জন্য উর্বর জমির প্রয়োজন হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রেই পতিত এবং অন্য ফসলের চাষের অনুপযুক্ত জমিতেও সিসল সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা যায়। সিসলের পাতায় মোম জাতীয় জৈব পদার্থের স্বাভাবিক প্রলেপ থাকার ফলে, এই ফসল কীটশত্রু ও রোগ দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয় না। সেজন্য এই চাষে কৃষি বিষের ব্যবহার হয় না বা নগণ্য, তাই বলা যায় এই ফসলের চাষ প্রকৃতিকে দূষিত করে না।

ভারতে সিসল চাষের বর্তমান অবস্থা

ভারতে সিসল চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা মুশকিল। তবে বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত

সারণি-২
জোতের পরিমাণ ও কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে আদিবাসীদের অবস্থান

রাজ্য	জোতের পরিমাণ অনুযায়ী আদিবাসীদের শতকরা ভাগ		গ্রামীণ প্রান্তিক কর্মসংস্থান (মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ভাগ)			
			কৃষক		কৃষি-শ্রমিক	
	প্রান্তিক	ক্ষুদ্র	আদিবাসী	সাধারণ	আদিবাসী	সাধারণ
ওড়িশা	৬৬.৬১	২৩.৫৫	৫.০০	১২.০৬	৬৪.৯৫	১৯.৭৪
ঝাড়খণ্ড	৬০.৮৬	১৭.৭৫	৩.২৮	২৮.৮৮	৬১.০৬	১৬.৯২
ছত্তিশগড়	৪৫.২৫	২৫.১৬	১.২৯	২৪.৫৪	৭৩.৩৮	৮.৫১
মধ্যপ্রদেশ	৪২.০৩	২৮.৭২	৩.৫১	১৮.৩৭	৬৮.৭১	১৫.৪৪
পশ্চিমবঙ্গ	৮৩.৯৫	১২.৮৮	১০.৪৩	১০.০৭	৫৮.৭৬	৩১.৮৮
ভারত	৫৩.৯০	২৩.৯৯	৫.০৩	১৯.১৫	২৭.০৬	৫৯.৭০

সূত্র : স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রোফাইল অফ সিডিউল্ড ট্রাইব্স ইন ইন্ডিয়া, ভারত সরকার, ২০১৩

সারণি-৩
মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলের সিসল চাষের সম্ভাবনাময় আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাসমূহ

রাজ্য	জেলা
ওড়িশা	সুন্দরগড়, ঝারসুগুদা, সম্বলপুর, বরগড়, বোলাঙ্গির, কালাহাণ্ডি, কোরাপুট, মালকানগিরি
ঝাড়খণ্ড	রাঁচি, লোহারডাগা, গুমলা, পশ্চিম সিংভূম, গাড়ওয়া, পালামু
ছত্তিশগড়	দানেওয়াড়া, বাস্তার, সুকমা
মধ্যপ্রদেশ	ঝাবুয়া, মাণ্ডলা, দিন্দোরী, বারওয়ানি
পশ্চিমবঙ্গ	বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর

সিসলের জরিপ সম্বন্ধীয় একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ভারতে সিসলের চাষের মোট জমির পরিমাণ মাত্র ৪৩৩১ হেক্টর। যার বেশির ভাগটাই ওড়িশাতে (২১৯৭ হেক্টর), এছাড়াও মহারাষ্ট্র (৭২৬ হেক্টর), অন্ধ্রপ্রদেশ (৬৩২ হেক্টর), পশ্চিমবঙ্গ (৪১৬ হেক্টর), ঝাড়খণ্ড (৩৩৩ হেক্টর) ও মধ্যপ্রদেশ (২৭ হেক্টর) সিসল চাষ হয়। ভারতে সিসল মুখ্য ফসল হিসাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগঠিতভাবে চাষ করা হয় না। বরং আদিবাসী মানুষেরা বিচ্ছিন্নভাবে কিছুটা তাদের ব্যবহার্য তন্তুর জন্য, কখনও মূল ফসলের জমির চারধারের বেড়া হিসাবে (সিসলের পাতায় কাঁটা থাকায়) লাগান। তবে গত কয়েক দশক ধরে সিসল বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি এবং অ-সরকারি সংস্থার উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে ভারতে সিসলের চাষের মোট জমির পরিমাণ মাত্র ২২০০ থেকে ২৮০০ হেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এর থেকে তন্তু উৎপাদন হয় ১৪৩০-১৮২০ টনের কাছাকাছি।

ভারতে সিসল চাষের উন্নয়নের কিছু উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি, অ-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ার ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সিসলের চাষের উন্নয়নের চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগের অধীনস্ত সংস্থা, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, ওড়িশার সম্বলপুরে ১৯৬২ সাল থেকে সিসল গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে সিসল বিষয়ে গবেষণা, বিকাশ ও চাষের প্রসারের কাজে নিয়োজিত আছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপজাতি উপ-পরিকল্পনার (Tribal Sub Plan) অর্থানুকুল্যে এবং সিসল গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে সিসলের চাষের প্রসারের চেষ্টা করছে। বর্তমান লেখক প্রায় চার বছরের (২০০৮-২০১২ সাল) বেশি সময় ধরে ওড়িশার ওই সিসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে সিসল গবেষণা ও প্রসারের কাজে নিযুক্ত থেকে মালভূমি অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই আদিবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কাজ করেছেন এবং তার ফলে সিসলের চাষের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ বেড়েছে। ওড়িশার রাজ্য সরকারও তাদের মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে, প্রধানত মাটি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সিসল চাষ/ রোপণ, প্রতিপালন করে। ওড়িশাতে এই সরকারি বিভাগের বেশ কয়েকটি সিসল খামার আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নীলডুংরি, বেলডুংরি, বড়োগাঁও, ইতমা, সুন্দরগড়, রাজগাঙ্গপুরের খামারগুলি। পশ্চিমবঙ্গের লাল (ল্যাটেরাইট) মাটি অঞ্চলে—যেমন, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে—সিসল বিষয়ে সরকারি স্তরে কিছু কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বীরভূমের রাজনগর সিসল ফার্ম, কেলেঘাই সিসল গবেষণা কেন্দ্র, পশ্চিম মেদিনীপুরের আবাস সিসল ফার্ম সেই প্রচেষ্টার নিদর্শন। তবে বিভিন্ন কারণে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এই সিসল খামারগুলি সক্রিয় অবস্থায় নেই বললেই চলে। ছত্তিশগড় সরকারের বন উন্নয়ন পর্ষদ, সিসল চাষ ও ব্যবহারের মাধ্যমে আদিবাসীদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা করছে। এই রাজ্যের বস্তার ও রাজনন্দগাঁও জেলায় সিসাল চাষ শুরু হয়েছে এবং সিসল চাষিরা সমবায়ের মাধ্যমে সিসলের উৎপাদন ও বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বেশকিছু বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সিসল চাষের মাধ্যমে মুনাফা করতেন। তবে স্বাধীনতার পরে এবং ওই ব্যক্তিদের নিজস্ব কারণে সিসল চাষে ভাটা পড়ে। ইদানিং আবার কিছু অ-সরকারি সংস্থা সিসল চাষে উৎসাহ দিচ্ছে। যেমন, ওড়িশার কোরাপুট সিসল বিকাশ পরিষদ, কোরাপুট, কাকিরগুমা, নন্দপুর, মুচকুন্দ ইত্যাদি অঞ্চলে সিসল চাষ করে সাফল্য পেয়েছে। জব্বলপুর জেলার কিছু অ-সরকারি সংস্থা, তাদের চাষি সদস্যদের সিসল চাষের প্রশিক্ষণ এবং সিসলের উন্নত গুণমানের চারাও বিতরণ করেছে। আশার কথা যে দিল্লিতে সিসলজাত সামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য একটি বেসরকারি সংস্থা তৈরি হয়েছে। তবে এই বিচ্ছিন্ন অথচ সাধু প্রচেষ্টাগুলিও ভারতের মতো বিশাল দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই

সারণি-৪
আদিবাসী অঞ্চলে সিসল চাষের অর্থনৈতিক খতিয়ান (হাজার টাকা/প্রতি হেক্টরে)

খাত	প্রথম বছর	দ্বিতীয় বছর	তৃতীয় বছর	চতুর্থ বছর	পঞ্চম বছর	ষষ্ঠ বছর	সপ্তম বছর	অষ্টম বছর	গড়
জনমজুর ও ভাড়া	২০.১	১১.৮	২২.৮	২০.৪	১৯.৬	১৮.৮	১৭.৬	১৬.৪	১৭.৪
চাষের সরঞ্জামের খরচ	১৬.৫	৫.২	৫.২	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৫.০	৬.৫
চাষের মোট খরচ	**৩৬.৬**	**১৭.০**	**২৮.০**	**২৫.৪**	**২৪.৬**	**২৩.৮**	**২২.৬**	**২১.৪**	**২৪.৯**
সিসলের ফলন (কুইন্ট্যাল হেক্টর)	০	০	১২.০	১৫.০	১৫.০	১৩.০	১০.০	৮.০	১২.২
উৎপাদিত সিসলের মূল্য	০	০	৭২.০	১০৫.০	১০৫.০	৯১.০	৬৫.০	৪৮.০	৮১.০
অন্তর্বর্তী ফসলের মূল্য	৩০.০	৩০.০	৩০.০	—	—	—	—	—	—
মোট আয়	৩০.০	৩০.০	১০২.০	১০৫.০	১০৫.০	৯১.০	৬৫.০	৪৮.০	৭২.০
নিট লাভ	**–৬.৬**	**১২.৯**	**৭৩.৯**	**৭৯.৬**	**৮০.৪**	**৬৭.২**	**৪২.২**	**২৬.৬**	**৪৭.১**

চিত্র-১
ভারতে সিসলের আমদানির পরিমাণ (টন)

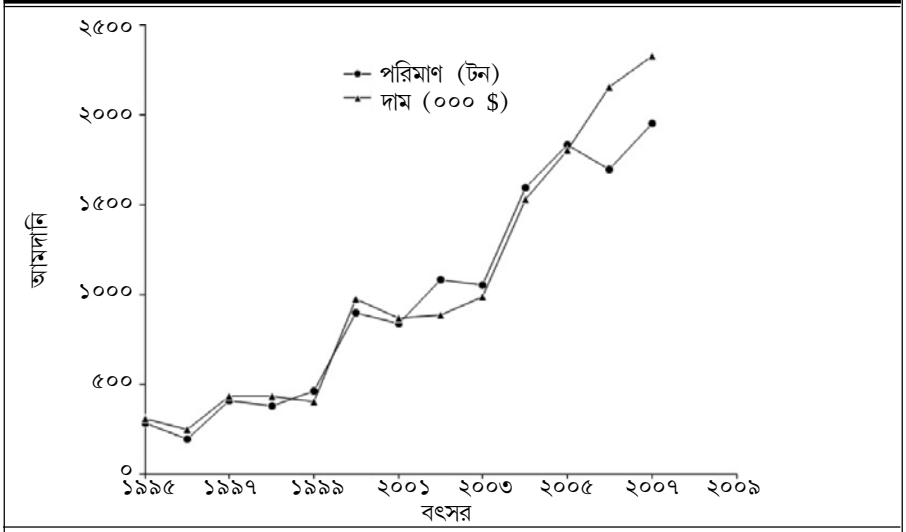

সূত্র : এফ.এ.ও. স্ট্যাটিসটিক্স

এখনও ভারতের সিসলের মোট চাহিদার বেশিরভাগটাই আমদানি করতে হয়।

সিসলের আমদানি এবং দাম

ভারতে সিসলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম করেও ১০-১৫ হাজার টন বা আরও বেশি। অথচ দেশে উৎপাদন হয় মাত্র ২ হাজার টন। এই ফারাকটা পূরণ করা হয় সিসল তন্তু আমদানির মাধ্যমে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। ভারতে সিসল (HS Code : 5305) আমদানি হয়ে থাকে তাঞ্জানিয়া, মাদাগাস্কার, ব্রাজিল ও কেনিয়া থেকে তুতিকোরিণ, কলকাতা, কোচিন, চেন্নাই ইত্যাদি বন্দরের মাধ্যমে (http://www.cybex.in)। গত ১৯৯৫ সালে ভারতে সিসলের আমদানির পরিমাণ ছিল ২৮৪ টন, পরে ২০০৭ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ১৯৫১ টন। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই সিসলের আমদানি ২০ হাজার টন ছাড়িয়ে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এই বিপুল পরিমাণ সিসল তন্তু আমদানি করতে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে। পরীক্ষায় প্রমাণিত যে ভারতীয় সিসল তন্তুর গুণমান, বিদেশ থেকে আমদানি করা সিসলের থেকে ভালো। ভারতে সিসলের দাম আগে কম থাকলেও বর্তমানে এর যথেষ্ট ভালো দাম (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য) পাওয়া যাচ্ছে। ফলে চাষিরা লাভবান হচ্ছেন। যদিও বিদেশ থেকে আমদানি করা সিসল তন্তুর দামের (১৮০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম) থেকে ভারতে উৎপাদিত সিসল তন্তুর দাম এখনও তুলনামূলকভাবে কম (৭০-৮০ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম)। যেহেতু চাহিদা অনুযায়ী সিসলের জোগান এ দেশে খুবই কম, তাই মিল মালিকেরা বেশি অর্থ ব্যয় করেও এই তন্তু আমদানি করেন। একথা নিঃসন্দেহ হয়ে বলা যায় যে, এ দেশে সিসল তন্তুর চাষ আরও ব্যাপকভাবে; বিশেষত মধ্য ভারতীয় মালভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে আদিবাসী মানুষদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে করা প্রয়োজন। যে যে আদিবাসী অধ্যুষিত জেলায় এই সিসল চাষ ব্যাপকভাবে হতে পারে তাদের তালিকা দেওয়া হল সারণি-৩-এ।

উন্নত পদ্ধতিতে সিসল চাষের মাধ্যমে আদিবাসী চাষির অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কিছু কিছু আদিবাসী চাষি প্রথাগতভাবে, তাও খুবই কম জমিতে সিসল চাষ করেন এবং ফলন হয় গড়ে মাত্র ৩০০ কিলোগ্রাম/হেক্টর হিসাবে। এতে চাষির অর্থনৈতিক কোনও সুরাহা হয় না। তাই উন্নত বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে সিসল চাষ করতে হবে। নিচু জমিতে প্রথাগত ফসল, যেমন ধান ও অন্যান্য তণ্ডুলজাতীয় ফসল এবং অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে লাইন করে জোড় দ্বিসারি (Double Row Planting) পদ্ধতিতে সিসলের চারা লাগানো, সুপারিশ মতো জৈব ও অজৈব (ও অনুখাদ্য) সারের সুষম ব্যবহার, চারা লাগানোর প্রথম দুই বছর অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে অল্প দিনে তোলা যায় এমন ডালশস্যের চাষ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা করতে পারলেই সিসলের উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ১৫০০ কিলোগ্রাম পাওয়া যাবে। যদি কোনও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষি, ফোঁটা সেচ (ড্রিপ) পদ্ধতির ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে সিসলের ফলন হেক্টরে ২৫০০ কিলোগ্রামের থেকেও বেশি হতে পারে; যা অত্যন্ত লাভজনক বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে হেক্টর প্রতি ১৫০০ কিলোগ্রাম ফলনেও যথেষ্ট লাভ হবে। একবার সিসল রোপন

চিত্র-২
ভারতে সিসলের দামের পরিবর্তন (টাকা/টন)

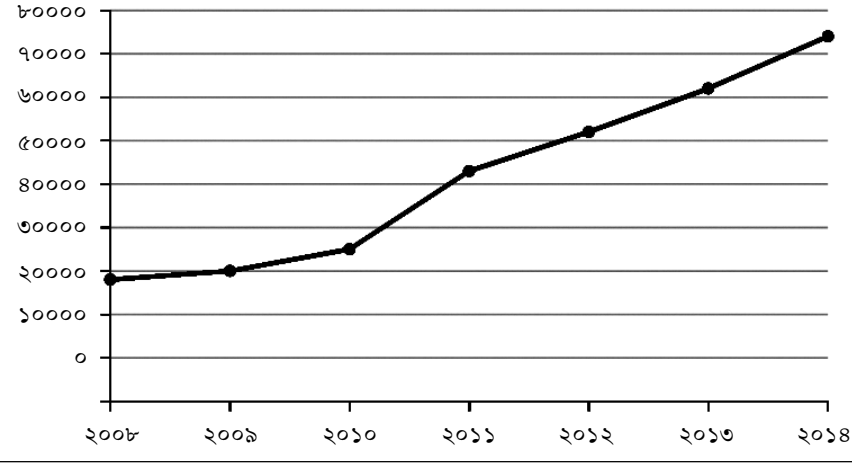

সূত্র : এফ.এ.ও.আর.-ক্রিজাফ

করলে ওই জমিতে ৮-৯ বছর পর্যন্ত সিসল থাকবে ও ফলন দেবে। প্রতি বছরের গড় হিসাবে হেক্টর প্রতি ৪৭ হাজার টাকা লাভ একজন আদিবাসী চাষিভাই সহজেই পেতে পারেন (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)। এই মালভূমি অঞ্চলের কম উর্বর ঢালু জমি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, উষ্ণ আবহাওয়া, ক্রমাগত ভূমিক্ষয় ইত্যাদি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সিসলের উৎপাদন অবশ্যই লাভজনক হবে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রচলিত ফসলের উপর নির্ভরশীল হলে চাষিদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি রোধ করা যাবে না। উন্নত পদ্ধতিতে সিসল চাষের সঙ্গে সঙ্গে, সিসল চাষিরা এলাকাভিত্তিক সিসল সমবায় তৈরি করতে পারেন, যার ফলে সিসল পাতা থেকে উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা তন্তু নিষ্কাশনের সুযোগ গ্রহণ, সিসল তন্তুর গাঁট তৈরি (বেইলিং) এবং এই সমবায়ের মাধ্যমে তন্তু একত্রিত করে উচ্চ দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে।

অন্যান্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণজনিত লাভ

আদিবাসীরা সিসল চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সরাসরি লাভবান তো হবেনই, সেই সঙ্গে এই ফসলের চাষের ফলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক লাভও পাওয়া যাবে। সিসল থেকে আদিবাসীদের আয়ের পথ মসৃণ হলে, বন সম্পদের উপর আদিবাসী জনগণের চাপ স্বভাবতই কমবে। সিসল তন্তু এবং বর্জ্য কাগজের মণ্ড তৈরিতে বিশেষ উপযোগী। তাই সিসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাগজের জন্য গাছ কাটার দরকার কমে আসবে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বনাঞ্চল সংরক্ষণে সাহায্য হবে। সিসল শিকড়ের বিস্তৃত জালের

মাধ্যমে মৃত্তিকা সংরক্ষণে সাহায্য করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে। সিসল চাষ ও সিসল তন্তু ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প তৈরি হবে। ফলে সরাসরিভাবে কর্মসংস্থান বাড়বে। সিসল তন্তুর মূল্য সংযোজক বিভিন্ন ছোটো ও মাঝারি শিল্প তৈরি হবে, যারা সিসলের নানা মাপের দড়ি, গৃহস্থালি ও শিল্পে ব্যবহৃত ব্রাশ, সাইকেলের চাকার ফুল, ঘর সাজানোর জিনিস, পাপোশ ইত্যাদি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে তৈরি করবেন ফলে গ্রামীণ আদিবাসী মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে বহুলাংশে স্বাধীন হতে পারবেন।

উপসংহার

মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলের পরিবর্তিত উষ্ণ জলবায়ু, কম ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং ভূমিক্ষয়ের মতো অসুবিধা সত্ত্বেও সিসলের উৎপাদন বজায় থাকে আর সেই সঙ্গে সিসল প্রাকৃতিক সম্পদ (মাটি, জল ইত্যাদি) সংরক্ষণে সাহায্য করে। তাই পরিবর্তিত জলবায়ুতে আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সিসলের ভূমিকা অপরিসীম। সিসল চাষ আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় অন্যান্য চাষিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক দৃঢ় এবং অপরিহার্য পদক্ষেপ। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন হবে যা আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা দূর করে আদিবাসীদের উন্নয়নের মূল ধারায় সামিল করতে সক্ষম হবে।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

সকলের জন্য আবাসন

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ